মহিম্নঃ পারং তে

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

নর্মদাবক্ষে ওঙ্কারাকৃতি দ্বীপে অধিষ্ঠিত আছেন দেবাদিদেব ওঙ্কারনাথ। ২০১২ সালের পুজোর ছুটিতে নির্বেদপ্রাণার সঙ্গে ওঙ্কারেশ্বর তীর্থ দর্শনে যাওয়ার সুযোগ এবং সৌভাগ্য হয়েছিল।

ওঙ্কারধাম পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেল। গজানন আশ্রমে থাকব। মালপত্র সেখানে রেখে প্রথমেই চললাম দেবদর্শনে। মন্দির চত্বরে ঢুকেছি, এক সৌম্য বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। ''সারদা মঠ?'' অবাক হলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বভারতীয় পরিচিতি আছে, সারদা মঠের নেই। এই অবাঙালি মানুষটি সারদা মঠ চেনেন? ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত—একটি চাদর জড়ানো—তার মানে পুরোহিত। তিনি সহাস্যে আমাদের যেন মন্দিরে আমন্ত্রণ জানালেন, যেন বহুদিনের পরিচিতি আমাদের সঙ্গে। চাদরে বাঁধা একগোছা চাবি বার করে একটি দরজা খুললেন, তারপর পাশের গলি দিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বরের কাছে। কোনও লাইনে দাঁড়াতে হল না। তারপর আবার এগিয়ে চললেন। অনুসরণ করলাম। মূল গর্ভগৃহের লাগোয়া পার্থসারথির মন্দির। বিরাট আট ফুট মূর্তি। অপেক্ষাকৃত নির্জন। গর্ভমন্দিরের বাইরে বারান্দার দুপাশে দুটো রোয়াকের মতন বসার জায়গা। আমাদের বসতে বললেন একটিতে, নিজে উল্টোদিকে বসলেন। তারপর সুন্দরভাবে বলতে শুরু করলেন, ''এই নর্মদার তীরে নর্মদা মায়ী এবং জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বরজীর নিত্য অধিষ্ঠান। এই ক্ষেত্র শঙ্করাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদের সাধনস্থল, কিশোর শঙ্করের গুরুগৃহ—এ সাধারণ জায়গা নয়। বহু সাধক এখানে পশুপাখির রূপ ধরে সাধনা করে চলেছেন এখনও।'' তিনি বলে চললেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিলাম।

ইনি ওঙ্কারেশ্বরের রাজপুরোহিত, নাম রমেশচন্দ্র পরসাই। পুরুষানুক্রমিকভাবে ওঙ্কারেশ্বরের মান্ধাতা রাজপরিবারের পুরোহিতবংশ হওয়ার সুবাদে মন্দির পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁদের হাতেই ছিল। উত্তরাধিকারসূত্রে এখন রমেশজী সেই দায়িত্বে আছেন। আমাদের প্রতি কী যে এক কন্যাস্নেহ অনুভব করেছিলেন বৃদ্ধ! পার্থসারথির গর্ভগৃহে আমাদের জপ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেখানে ছিলাম বারো দিন। প্রায় প্রতিদিনই তিনি একসময় আসতেন পার্থসারথির মন্দিরে। তাঁর সাড়া পেয়ে আমরা মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতাম। সেই রোয়াকে বসে তিনি গল্প শোনাতেন। গল্প নয়—সব সত্য ঘটনা। আশ্চর্য

মন্দিরে মহাদেবের পাশাখেলার আয়োজন

সেসব অভিজ্ঞতা। কিছু তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন, কিছু বা শুনেছেন তাঁর পিতা-পিতামহের কাছ থেকে। দেবাদিদেবের লোকাতীত মহিমায় জাগ্রত এই তীর্থ বহু সাধকের অধ্যাত্মসাধনায় স্পন্দিত। আমরা শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে যেতাম। এরকমই একটি কাহিনি।

ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরের চাতালে বহু ব্রাহ্মণ বসে পাঠ-প্রবচন করেন। উৎসুক অনেক তীর্থযাত্রী পাশে বসে শোনেন, প্রণামী দেন। এরকমই একজন পাঠক ভোলা। অন্য কোনও জীবিকা নেই তাঁর। পাঠ করে যেটুকু সামান্য আয় হয় তাতে গ্রাসাচ্ছাদন হয়ে যায় পরিবারের। মন্দির থেকে সামান্য মাসোহারাও পান। সেই কিশোর বয়স থেকে প্রতিদিন একভাবে শিবের মহিমা বর্ণনা করে চলেছেন। বাবা হাত ধরে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। এখন যৌবন অতিক্রান্ত। প্রৌঢ়ত্বের রং চুলে, ত্বকে। কিন্তু মনেও অদ্ভুত রং ধরেছে কিছুদিন যাবৎ। শিবের মহিমা তো কতই গান গেয়েছেন, রোজ ভক্তিভরে শিবলিঙ্গ দর্শনও করে চলেছেন, কিছুদিন হল শুধু মনে হচ্ছে, যাঁর রূপ বর্ণনা করে আমার দিন কাটে, পেটের অন্ন জোগাড় হয়, সত্যিই কেমন রূপবান তিনি? আমি কি কোনওদিন সেই রূপ একবার নয়ন ভরে দেখতে পাব? ওই মধুর মনোহর করুণাঘন মূর্তির কথা পড়তে পড়তে বিহ্বলতা আসে, চোখ ছাপিয়ে জল নামে। এ কী অদ্ভুত ভাবান্তর! এরকমটা তো এতদিন হয়নি! বড় আকুলিবিকুলি করে যে মনটা! ''হে প্রভু, আমি তোমার কোনও সেবা, পূজা, তপস্যা করিনি। যেটুকু পাঠ করেছি, তার বিনিময়ে অর্থও গ্রহণ করেছি। শুধু তোমার জন্য, তোমার স্তুতি করে, অনাহারে, অর্ধাহারে, কেবল তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিন কাটাইনি তো! আমার মতন অকৃতী অধমের প্রতি কি কোনওদিন তোমার কৃপা হবে? আমার মন বুঝেছে, প্রাণ যে বোঝে না।''

দিন যায়, ভোলার ব্যাকুলতা বাড়ে। মহাদেবের অদর্শন আর যেন সহ্য হয় না। একদিন তাঁর মনে হল—যেভাবেই হোক, ছলে, কৌশলে—আমায় তাঁর দেখা পেতেই হবে। শয়নারতির পরে মহাদেবের চতুরঙ্গ খেলার ব্যবস্থা করা হয়। রাতে পার্বতীর সঙ্গে পাশা খেলেন তিনি। একটা দোলনায় সাজিয়ে দেওয়া হয় খেলার সাজ, মাটিতেও বিছিয়ে দেওয়া হয় পাশাখেলার সব সরঞ্জাম।

ভোলা ভাবেন—যদি কোনওভাবে লুকিয়ে মন্দিরের গর্ভগৃহে থেকে যেতে পারি, তাহলে তো রাতে তাঁর দর্শন হবে! আর তর সয় না। সেই রাতেই অতিচুপিসারে ব্যবস্থা করতে শুরু করলেন ভোলা। অন্ধকারে যেন মিশে রইলেন বড় বড় খিলানের গা ঘেঁষে। কেউ টের পেল না। একের পর এক তালা পড়ে গেল বিশাল দরজাগুলিতে। চাবির গোছার

ঝনঝন শব্দ দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে গেল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ভোলা শিবের ধ্যানে মগ্ন হলেন। রাত বারোটা, ঝুমঝুম শব্দ! চমকে উঠে ভোলা চোখ মেলতে গেলেন। আঃ এ কী? তাঁর দুচোখের পাতা যে আটকে গেছে, খুলছে না। অন্ধকার গাঢ় থেকে আরও গাঢ়, ''হে মহাদেব, হে ওঙ্কারেশ্বর, আমি যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'' একটা আর্ত হাহাকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে গ্রাস করল ভোলার সমস্ত সত্তা!

পরদিন হইহই মন্দির জুড়ে। গর্ভমন্দিরে পাওয়া গেছে অজ্ঞান ভোলাকে। চুরি করতে ঢুকেছিলেন তিনি? ক্রুদ্ধ জনতা। এত দীর্ঘ বছর মন্দিরের সঙ্গে ঘরবসত করে এ কী দুর্মতি? মারধরের জন্য হাত উঠে যাচ্ছিল ছোকরা পাণ্ডাদের। বয়োজ্যেষ্ঠরা থামালেন। আগে জ্ঞান ফিরুক। জ্ঞান ফিরলেও দৃষ্টি ফিরল না হতভাগ্য ভোলার। চোখের জল গড়িয়ে যেতে লাগল গাল বেয়ে, বুক বেয়ে। কোনও প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া গেল না দুচোখ-ভরা জল ছাড়া। সবাই ধরাধরি করে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

কিন্তু মন্দিরের আসা বন্ধ হল না ভোলার। এখন বাড়ির লোক তাঁকে ধরে মন্দির চাতালে তাঁরই নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিয়ে যায়। তিনি শুধু বসেই থাকেন। আর কোন গভীর গোপন অভিমানে কখনও ফুঁপিয়ে ওঠে। অন্ধকার নেমে আসে। আবার বাড়ির লোক তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। চলতে থাকে ভোলার অশ্রুসজল নীরব প্রার্থনা। ''এমন কি অপরাধ করেছিলাম প্রভু যে এত বড় শাস্তি দিলে? বাপ মাকে দেখতে চাওয়া কি সন্তানের পক্ষে অপরাধের? লুকিয়ে তোমার কাছেই পৌঁছতে চেয়েছিলাম, তোমায় ছেড়ে তো যেতে চাইনি? ভালবাসলে কি এই প্রতিদান দিতে হয়? তবে যে সবাই তোমায় করুণাময় বলে?''

এভাবে কেটে গেল ছয়-ছয়টি মাস। এক সুপ্রভাত। বাইরের সূর্য পুবের আকাশ রাঙাল। সেই আলো চোখে ধরা দিল না, কিন্তু হঠাৎ ভোলার অন্তর শতসূর্যের দীপ্তিতে ভাস্বর হল। ভোলা স্পষ্ট দেখতে পেলেন সদাশিব আর পার্বতী পাশাপাশি বসে আছেন। পার্বতী বলছেন বীণানিন্দিত স্বরে, ''প্রভু, তোমার ভক্তকে আর কত কষ্ট দেবে? সে যে তোমা বই কিছু জানে না। সমস্ত পৃথিবীর আলো সরিয়ে নিয়েছ, দীর্ঘ কঠোর তপস্যা করিয়ে চলেছ। আমি মা যে, আর সহ্য হয় না। এবার কি তুমি তার দিকে চোখ মেলে চাইবে না?''

প্রসন্নহাসিতে উদ্ভাসিত সেই যুগলমূর্তি দেখতে দেখতে আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গের দোলায় ভেসে চললেন ভোলা। ''আহা প্রভু, এত নয়নমনোহর রূপ তোমার। কী ছাই ব্যাখ্যা বর্ণনা করে এসেছি এতদিন! তোমার মহিমাকে ছাপিয়ে কোন অনন্তের ইঙ্গিত তোমার রূপে! আমাদের মানবভাষা কি পারে তোমায় স্পর্শ করতে? শব্দের আখরে তোমার গুণ গাইতে? এজন্যই বুঝি আমার চোখের আলো নিভিয়েছিলে? যাতে আলোকহীন দীপ্তিতে আমার অন্তর শুধু তোমাতে ভরে থাকে?''

সেই নিবিড় সমাধির গভীর আনন্দ থেকে উদ্গীত এক মধুরতর কণ্ঠস্বর শুনলেন ভোলা : ''ভোলা, আগামীকাল তুমি চল্লিশবার শিবমহিম্নস্তোত্র পাঠ কোরো, আর প্রতি পাঠের শেষে এই স্তম্ভটি একবার করে প্রদক্ষিণ কোরো।''

তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যুগলমূর্তি। পরদিন অতি প্রত্যূষে ভোলা এলেন মন্দিরপ্রাঙ্গণে। শুরু হল পাঠ আর প্রদক্ষিণ। ধীরে ধীরে বেলা গড়িয়ে গেল, সূর্য ডুবল নর্মদার কোলে। চল্লিশতম পাঠ শেষ হল, শেষ হল প্রদক্ষিণ। আর তখনই আবার ঝলমল করে উঠল চেনা মন্দির, আলোকোজ্জ্বল মন্দিরপ্রাঙ্গণ। ভোলা দৃষ্টি ফিরে পেলেন। কিন্তু অন্ধকার এতদিনে তাঁর হৃদয়ে যে-অনির্বাণ প্রদীপ শিখাটি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, সেটা আর নিভল না।